Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2347-8055
Vol. 11 - 2023

ভারতীয় ভাষাদর্শনে বৌদ্ধ দার্শনিকদের অবদান

কৌশিক সিংহ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ, ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences
Vol. 11 originally published online November 2023

The online version of this article can be found at: http://www.arunananjournal.org/

Published by

www.anurananjournal.org

Additional services and information for
Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences can be found at:

About the Journal: http://www.anurananjournal.org/about-us/
Editorial Board: http://www.anurananjournal.org/editorial-board/
Submission Guidelines: http://www.anurananjournal.org/submission-guidelines/
Contact: http://www.anurananjournal.org/contact-us/

© 2023 Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Vol.11 : 2023 | **ISSN 2347-8055**

ভারতীয় ভাষাদর্শনে বৌদ্ধ দার্শনিকদের অবদান

কৌশিক সিংহ

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ, ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

সংক্ষিপ্তসার

ভারতীয় ভাষাদর্শনের ইতিহাস অতি-প্রাচীন। প্রাচীন ভারতের মুণি-ঋষিগণের অতি সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা ভারতীয় ভাষাদর্শনকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছে। ঋগ্বেদের যুগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতীয় ভাষাদর্শন ধীরে ধীরে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। একদিকে পানিনি, চান্দ্র, জৈনেন্দ্র, পাতঞ্জল, ভতৃহরি প্রমুখের রচনা ব্যাকরণকেন্দ্রিক এক স্বতন্ত্র দর্শন-প্রস্থান যেমন ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে; অন্যদিকে তেমনি ন্যায়, মীমাংসা, বৌদ্ধ, জৈন– এই সকল দর্শন-প্রস্থানগুলিও ভারতীয় ভাষাদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ভাষা শব্দার্থ হওয়ায় 'ভাষার দর্শন' আলোচনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে যেটি এসে পড়ে, সেটি হল 'শব্দ'। তাই শব্দ সংক্রান্ত বিবিধ আলোচনা, যেমন– শব্দের স্বরূপ কি? শব্দ মাত্রই কি অর্থবোধ ঘটায়? ইত্যাদি বিষয় ভাষাদর্শনের আলোচনার মধ্যে এসে পড়ে। শব্দ নিত্য না অনিত্য? এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় ভাষাদর্শনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির আদিতে একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিল।১ এর থেকে জানা যায় ব্রহ্মবাদে সব কিছুই অনিত্য। সাংখ্য সূত্রকার মহর্ষি কপিল, বৈদিক বা লৌকিক কোন শব্দের নিত্যতা স্বীকার করেন নি। ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনেও শব্দের নিত্যতা স্বীকৃতি হয়নি। একমাত্র পূর্বমীমাংসা দর্শনে শব্দ, অর্থ এবং তাদের মধ্যেকার সম্বন্ধ নিত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। শঙ্করাচার্য, রামানুজ প্রভৃতি বৈদান্তিকগণ শব্দের নিত্যতা এবং অর্থের সঙ্গে শব্দের নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন। অবশ্য পরবর্তীকালে কোন কোন বৈদান্তিকগণ যেমন, ধার্মরাজাধ্বরীন্দ্র তাঁর 'বেদান্ত পরিভাষা' গ্রন্থে শব্দের অনিত্যতা স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ দার্শনিকদের ভাষান্তর্গত শব্দের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকাঃ

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ শব্দের নিত্যতা স্বীকার করেন না। তাঁদের যুক্তি এই যে, কোন ব্যক্তি যখন শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করেন, তখন আমরা ওই বাক্য ও শব্দকে শ্রবণ করি। বাক্য উচ্চারিত না হলে সেই বাক্য শ্রবণ করা সম্ভব নয়। উচ্চারণের পূর্বে শব্দের অস্তিত্ব বৌদ্ধ দার্শনিকগণ স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁদের মতে, শব্দের উচ্চারণেই তার সৃষ্টি। বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত তাঁর 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২] বৌদ্ধ দার্শনিকরা কেবলমাত্র 'মানুষ' প্রভৃতি সচেতন বস্তুমাত্র-কে শব্দ উচ্চারণের কারণ বলে মনে করেন না। তাঁরা 'পর্বত' প্রভৃতি স্থানকেও শব্দের কারণ বলে মনে করেছেন। কেননা মানুষের উচ্চারিত শব্দ পর্বত প্রভৃতি হতে কিছুটা ভিন্ন আকারে প্রতিধ্বনিত হওয়ার জন্যই তাঁরা এইরকম অনুমান করেছেন। বৌদ্ধাচার্যগণ মনে করেন, মানুষের উচ্চারিত শব্দ পর্বতে আহত হয়ে বিলীন হয়ে যাওয়ার পর সেখানে অনেকটা অনুরূপ অপর

শব্দ উৎপন্ন হয়, এবং সেই দ্বিতীয় শব্দই পুনরায় কিছুটা ভিন্ন আকারে আমাদের শ্রবণ পথের পথিক হয়ে থাকে। প্রতিধ্বনি যদি মূল শব্দ হতে অভিন্ন হত, তাহলে মূল শব্দের উচ্চারণ ও প্রতিধ্বনির উচ্চারণের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকত না।[৩] বৌদ্ধ আচার্য কমলশীল 'তত্ত্বসংগ্রহ' পঞ্জিকা গ্রন্থে বলেছেন যে, যেহেতু সবকিছুই অনিত্য এবং ক্ষণস্থায়ী কাজেই শব্দ কখনো নিত্য বা স্থায়ী হতে পারে না। সুতরাং শব্দকেও তিনি ক্ষণস্থায়ী বলে মনে করেন।

ভারতীয় শব্দশাস্ত্রে 'স্ফোটবাদ' শব্দটি সর্বজনবিদিত। স্ফোটবাদ সংক্রান্ত চিন্তা কোন্ সময়ে ভারতের চিন্তা জগতে আবির্ভূত হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে স্ফোটবাদ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরানেও 'স্ফোট' শব্দের প্রচলন দেখা যায়।[৪] এখন প্রশ্ন হল, 'স্ফোট' বলতে কি বোঝায়? পদার্থদীপিকা'য় বলা হয়েছে, যা থেকে অর্থের প্রকৃতি হয় তাই 'স্ফোট'।[৫] সাধারণত শব্দের উচ্চারণের ফলেই অর্থের প্রকৃতি হয়ে থাকে। কাজেই, এই ব্যাখ্যানুযায়ী বলা যেতে পারে, শব্দোচ্চারণই স্ফোট। অবশ্য কোন কোন আচার্য শব্দ উচ্চারণের পূর্বাবস্থাকে স্ফোট বলেছেন। আবার কোন কোন আচার্য, অর্থ প্রতিপাদন সমর্থ শব্দের স্ফোটত্বক স্বীকার করেছেন। আচার্য কুমারীল ভট্ট তার মীমাংসা 'শ্লোকবার্ত্তিক' গ্রন্থে শব্দার্থ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন— "ন অর্থস্যঃ বাকে স্ফোট বর্ণেভ্যে ব্যতিরেকঃ"। অর্থাৎ বর্ণের অতিরিক্ত ভাবে স্ফোট বলে এমন কিছু নেই, যার দ্বারা অর্থের প্রকৃতি হতে পারে। মহর্ষি উপবর্ষ মীমাংসা প্রভৃতি কয়েকটি দর্শন শাস্ত্রের বিস্তৃত টীকা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[৬] শব্দের স্বরূপ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে শবরস্বামী তাঁর মীমাংসা ভাষ্যে এবং আচার্য শঙ্করাচার্য তাঁর বেদান্ত ভাষ্যে প্রমাণ হিসেবে উপবর্ষের মতের উল্লেখ করেছেন। উপবর্ষের মতে, কার্য গুলিই শব্দ।[৭] 'গো' পদটি উচ্চারণ করার সময় প্রথমে 'গ' বর্ণের উচ্চারণ হয়, তারপর 'ঔ' এবং বিসর্গের (ঃ) উচ্চারণ হয়ে থাকে। এই জন্য উপবর্ষ 'গ' প্রভৃতি বর্ণ গুলিকেই শব্দ নামে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীকালে মীমাংসক এবং বৈদান্তীকগনও উপবর্ষের এই মতটি গ্রহণ করেছেন।[৮] সুতরাং তাঁদের মতে, বর্ণাতিরিক্ত স্ফোট বলে কিছু নেই। শবরস্বামী, পার্থসারথি মিশ্র প্রমুখ মীমাংসকগণ বর্ণকেই শব্দ রূপে স্বীকার করে সেই শব্দের নিত্যতা ঘোষণা করেছেন। পার্থসারথি মিশ্র শাস্ত্রদীপিকা নামক গ্রন্থে, বর্ণ ব্যতিরিক্ত শব্দের অবস্থিতি অস্বীকার করেছেন।[৯]

ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ 'স্ফোট' স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে শব্দের অর্থ প্রতিপাদনে কেবলমাত্র সংকেতেই সহায়তা করে, সুতরাং সংকেতের দ্বারাই অর্থের প্রতিপাদন হওয়ায় স্ফোট নামক অতিরিক্ত কোন কিছুর স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা নেই। ন্যায়সূত্রাকার মহর্ষি গৌতম তার ন্যায়সূত্রে (২/১/৫৫) এবং বৈশেষিক সূত্রাকার মহর্ষি কনাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে (৭/২/২০) এই সংকেত বা সময়ের উল্লেখ রয়েছে। বৈশেষিক সূত্রের ব্যাখার উপস্কার টিকাকার শঙ্করমিশ্র স্ফোটের বিরুদ্ধে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। শঙ্করমিশ্র বৈশেষিক সূত্রের (২/২/১১) ব্যাখ্যায় স্ফোটের যে কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই তা প্রতিপাদন করেছেন। তাঁর ভাষায়— "সংকেতবদবর্ণত্বম্ পদত্তম্, তথা চ সংকেত বলাদেব পদাদর্থপ্রতীতৌ কিংস্ফোটেন"। কোনো কোনো শাব্দিক দার্শনিকদের মতে, পূর্ব-পূর্ব উচ্চারণ হতে উৎপন্ন সংস্কার এবং তার থেকে উৎপন্ন স্মৃতির সঙ্গে সমৃদ্ধাচরন বর্ণই হল স্ফোট।

শব্দার্থক বিষয়ক এই মীমাংসক মতের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের উপস্থাপিত এই সকল বিরুদ্ধ যুক্তিগুলি বৌদ্ধ ভাষাদর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে। বৌদ্ধ দার্শনিকরা বলেছেন মীমাংসকরা ভাব পদার্থ মাত্রকে নিত্য বলে স্বীকার করেছেন। যদি তাই হয়, তাহলে সংস্কারও যেহেতু ভাব পদার্থ তাই শব্দ এবং অর্থের মতো সংস্কারকেও নিত্য বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এমনটি সম্ভব নয়। কেননা সংস্কার যদি নিত্য হত তাহলে সংস্কার সদা জাগরুক থাকতো, ফলস্বরূপ সকল সময়ে সকল বস্তুর জ্ঞান হত। কিন্তু এই রকম হয় না, কাজেই বলতে হয় এইরূপ সংস্কার অর্থের প্রকাশ করতে সমর্থ নয়। আবার যদি বলা হয় সংস্কার ভাব পদার্থ নয় তাহলে অর্থের সঙ্গে শব্দের নিত্য সম্বন্ধটাই অসম্ভব হয়ে যায়। সুতরাং সম্বন্ধ নিত্যতাবাদী মীমাংসকগণ একথা বলতে পারেন না।[১০] এই আলোচনা থেকে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, অন্যাপোহই শব্দ। বৌদ্ধ মতে, শব্দ এবং অর্থ উভয়ে অন্যাপোহ স্বরূপ। বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত তাঁর 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থে এবং আচার্য কমলশীল তাঁর 'তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা' নামক ভাষ্য গ্রন্থে এই বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাদের বক্তব্যের অভিপ্রায় এই যে, 'গো' শব্দ উচ্চারণ করলে তার স্বরূপ সম্পর্কে একমাত্র এই কথাই বলা যায় যে, এটি 'গো' শব্দ ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। অতএব তাঁদের মতে, এই অন্যাপোহই শব্দের স্বরূপ।[১১]

বৌদ্ধ মতে, প্রবাহমান স্বলক্ষনই একমাত্র সত্য, সামান্য বা জাতি বলে কিছু নেই। জাতি বা সামান্য মানব মনের বস্তুশূন্য কল্পনামাত্র।[১২] বৌদ্ধ দার্শনিকরা বলেন যে, যখন কতকগুলি পশুকে 'গো' বলা হয়, তখন বিভিন্ন 'গো'-র মধ্যে গোত্ব বলে কোন অনুগত ধর্ম স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। তাঁরা বলেন জাতি অপোহরূপ।[১৩] কতগুলি পশুকে 'গো' বলার দ্বারা বোঝানো হয় যে, এরা গো ভিন্ন জ্ঞান থেকে পৃথক। 'গো' ভিন্ন সমস্ত পদার্থের ভেদেই গোত্ব, সুতরাং তা অভাবরূপ।[১৪] 'গো' ভিন্ন ভেদ রূপ অভাব পদার্থ দ্বারা অনুগত অনুভূত জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে যায়, তাই জাতি বা সামান্য এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ থাকে না। বৌদ্ধগণের এই মতবাদ 'অপোহবাদ' নামে পরিচিত।[১৫] 'অপোহ' বলতে অন্যাপোহ বা অন্য-ইতর কোন বস্তুর নিষেধকে বোঝানো হয়েছে। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে, স্বলক্ষনই একমাত্র সত্য, সেহেতু সামান্য বা জাতি বলে কোন কিছুই থাকতে পারে না। 'শব্দ' বা বস্তুর নাম সরাসরি ক্ষনিক স্বলক্ষন কে নির্দেশ করতে পারে না। যে সময়ে নাম বস্তুকে নির্দেশ করে, বস্তু ক্ষনিক হওয়ায় সেই মুহূর্তে তা অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। তাই অন্য বস্তুর নিষেধের দ্বারাই শব্দ অর্থ কে বোঝাতে পারে। শব্দের এই পরোক্ষ অভিধেয়ত্বই বৌদ্ধ পরিভাষায় 'অপোহ' নামে পরিচিত।[১৬]

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোন বাস্তব সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। অথচ শব্দ যে অর্থ প্রতিপাদন করে একথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাই একে অস্বীকার করাও চলে না। অর্থের সঙ্গে যদি শব্দের কোন সম্বন্ধই না থাকে, তাহলে কোন শব্দ অর্থ প্রতিপাদন করবে কিভাবে? এই সমস্যার সমাধানকল্পে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটি কাল্পনিক সম্বন্ধ রয়েছে, যে সম্বন্ধটি মনুষ্যসৃষ্ট ও সাময়িক হলে, একই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উভয়ের জ্ঞান হত, কিন্তু যেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা শব্দকে জানি সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা অর্থকে জানতে পারিনা। কাজেই উভয়ের মধ্যে তাদাত্ম সম্বন্ধ অসম্ভব। ভতৃহরি প্রদর্শিত 'অগ্নিশিখা' দৃষ্টান্তটি উত্তমরূপে বিবেচনা করে

'স্ফোট' এবং 'স্ফোটতর' উভয়বিধ শব্দেরই একজাতীয়তা প্রতিপন্ন হয়। উল্লিখিত 'জীবিত' শব্দের মধ্যে একটিকে নিত্য বললে অপরটিকেও নিত্য বলতে হয়; এবং তারা কি পূর্ববর্তী অগ্নিশিখার বিনাশের পর উৎপন্ন হয়, না তারাই এক একটি পরিবর্তিত অবস্থারূপে আত্ম প্রকাশ করে থাকে? অগ্নিশিখার উৎপত্তির প্রকার সম্বন্ধে আলোচনা করলেই এই প্রশ্নের সমাধান হবে। যখন কোন দাহ্য পদার্থের সাথে অগ্নির সংযোগ হয় তখন উক্ত দাহ্য পদার্থের এক একটি অংশ দগ্ধ করে অগ্নি এক একটি শিখা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম অংশটুকু দগ্ধ করবার সময়ে অগ্নিশিখা উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় অংশ দগ্ধ করবার সময় তার আর অস্তিত্ব থাকে না। তখন দ্বিতীয় আরেকটি নতুন অগ্নিশিখার উদ্ভব হয়ে থাকে। এইভাবে, প্রত্যেকটি অগ্নিশিখাই সম্পূর্ণ পৃথকভাবে আত্মপ্রকাশ করে বলে আমরা উপলব্ধি করে থাকি। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে, দাহ্য পদার্থের দহনেই অগ্নিশিখার উৎপত্তির কারণ; এবং দাহ্য কার্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশিখার বিনাশও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব, আদি থেকে অন্তঃ পর্যন্ত প্রত্যেকটি অগ্নিশিখাই যে উৎপত্তি-বিনাশশীল একথা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। শব্দের উৎপত্তি যদি অগ্নিশিখার উৎপত্তির অনুরূপ হয়, তাহলে স্ফোট এবং স্ফোটতর সকল শব্দকেই কার্য বলা উচিত।

পরিশেষে বলা যায়, স্ফোটের এরূপ ব্যাখ্যা অনুসারে স্ফোট শব্দের দ্বারা যেমন বাচক শব্দ বোঝায় তেমনি বাচ্যার্থকেও বোঝায়। স্ফোটবাদীগণের এই সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে সমগ্র শাব্দিককূল দুইভাবে বিভক্ত হয়েছে। প্রথম পক্ষের মতে, মাধ্যমানাদব্যঙ্গ সূক্ষ্ম ধ্বনি বিশেষেই স্ফোট। অন্যদিকে, দ্বিতীয় পক্ষের মতানুসারে পূর্বচারি বর্ণের স্মৃতির সাহায্যে অন্তিম বর্ণের উচ্চারণই স্ফোট। দ্বিতীয় পক্ষের এই মতটি অতি প্রাচীন মত। মীমাংসা দর্শনের ভাষ্যকার স্ববরস্বামী, স্ফোটের এইরূপ ব্যাখ্যার সমালোচনা করেছেন এবং স্ফোটোবাদের বিরুদ্ধে নানান যুক্তির আরোপ করেছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এবং ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য এইরূপ স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে নানান আপত্তির উল্লেখ করেছেন। তথাপি আচার্য ভতৃহরি তার 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে, পূর্ব পূর্ব বর্ণ উচ্চারণ স্মৃতি সম্মিলিত চরম বর্ণের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। তাই পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ বিষয়ক বৌদ্ধ দার্শনিকদের অভিমত অন্যান্য সকল দর্শন সম্প্রদায়ের সঙ্গে খুব একটা বিরোধিতায় না গিয়েও স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পেরেছেন। বৌদ্ধগণ শব্দার্থের বাস্তব সম্বন্ধ স্বীকার করেন না, কেবলমাত্র একটি কাল্পনিক সম্বন্ধ স্বীকার করেন যেটি ব্যবহারকালীন নিত্য নয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেব (ছান্দোগ্য; ৬ষ্ঠ প্রপাঠক; পৃ-৩৮৭)

২. তত্রাকর্ত্তৃকবাকাস্য সম্ভবার্থাবসঙ্গতৌ।
তস্মাদসম্ভবি প্রোক্তং প্রথমং শাব্দ লক্ষণম্।। (তত্ত্বসংগ্রহ; কারিকা: ১৫০০)

৩. প্রদেশস্যাপি শব্দকারণত্বমস্তোব, পর্ব্বতকুহরাদাবনদৃশশব্দ- শ্রবণাৎ (পঞ্জিকা, ১৫২২ কারিকার ব্যাখ্যা)

৪. দিশাং ত্বমবকাশোহস্তি দিশঃখং স্ফোট আশ্রয়ঃ।
নাদো বর্ণস্ত্বমোঙ্কার আকৃতীনাং পৃথক কৃতিং।। (শ্রীমদ্ভাগবতম্; ৮৫অধ্যায়)

৫. স্ফুটত্যর্থোহস্থাদিতি ব্যুৎপত্ত্যা স্ফোটঃ পরমলযুমঞ্জুষা।

স্ফুটতি প্রকাশতেহর্থোস্মাদিতি স্ফোটো বাকে ইতি যাবৎ। (পদার্থদীপিকা)

৬. ভট্টাচার্য, শ্রী রবীন্দ্র কুমার, শব্দতত্ত্ব, সদেশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ: ১১।

৭. বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ। (শঙ্করভাষ্য, বেদান্তসূত্র ১/৪/২৮)

৮. ভট্টাচার্য, শ্রী রবীন্দ্র কুমার, শব্দতত্ত্ব, সদেশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ: ১২।

৯. তন্মাদ্ ব্যঞ্জক- ধ্বনীনাং ক্রমেন ব্যঙ্গ্যেবু বর্ণেষু সমারোপিতেন তদ্বন্তঃ স্মর্য্যমানা বর্ণা বাক্যেঃ, নানং শব্দোহস্তি।

(শাস্ত্রদীপিকা ১/১/৫)

১০. ভাবাচ্চাবাতিরিক্তত্বান্নিত্যত্বং সংস্কৃতেরপি।

প্রপ্নোতি, তেন বস্তুনং বিজ্ঞানাং সর্ব্বদাভবেৎ।।

ব্যতিরেক তু তস্যেতি সম্বন্ধো মোপপদ্যতে। (তত্ত্বসংগ্রহ, শ্লোক: ২৫১৪-১৫)

১১. ভট্টাচার্য, শ্রী রবীন্দ্র কুমার, শব্দতত্ত্ব, সদেশ, কলকাতা, ২০০৮, পৃ: ১৬।

১২. মন্ডল. প্রদ্যেত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৯, পৃ: ১৮৮।

১৩. বাগচী. দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৮, পৃ: ১৯৮।

১৪. তর্কবাগীশ. ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড, প:ব:রা:পু:প:, ২০১৪, পৃ: ১০২।

১৫. বাগচী. দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৮, পৃ: ১৯৪।

১৬. মন্ডল. প্রদ্যেত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৯, পৃ: ১৮৮।

১৭. নতদুদ্ভবঃ। (তত্ত্বসংগ্রহ, শ্লোক: ১৫১৪)

গ্রন্থপঞ্জী

১) কর. গঙ্গাধর, শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, মহাবোধী বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৩।

২) দাস. করুণাসিন্ধু, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬।

৩) বাগচী. দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০০৮।

৪) বাগচী. যোগেন্দ্র নাথ, বাক্যার্থ্য নির্ণয়ের দার্শনিক পদ্ধতি, কলকাতা, ১৯৮১।

৫) ভট্টাচার্য, শ্রী রবীন্দ্র কুমার, শব্দতত্ত্ব, সদেশ, কলকাতা, ২০০৮।

৬) ভট্টাচার্য. মোহন ও ভট্টাচার্য. দীনেশ চন্দ্র,ভারতীয় দর্শনকোষ (ন্যায়–বৈশেষিক দর্শন), সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা।

৭) ভট্টাচার্য. মোহন ও ভট্টাচার্য. দীনেশ চন্দ্র,ভারতীয় দর্শনকোষ, (বেদান্ত), সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৩৮৮বঙ্গাব্দ।

৮) ভট্টাচার্য. মোহন ও ভট্টাচার্য. দীনেশ চন্দ্র, ভারতীয় দর্শনকোষ (সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন), সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।

৯) মন্ডল. প্রদ্যেত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৯।

১০) সেন. বিশ্বনাথ, জ্ঞানতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা, ব্যানার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫।

লেখক পরিচিতি:

কৌশিক সিংহ বর্তমানে বাঁকুড়ার ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের স্টেট এডেড কলেজ টিচার পদে অধ্যপনায় নিযুক্ত।